ষোড়শ অধ্যায়	বিশ্বরাজনীতিতে সংকটের ঝটিকাকেন্দ্র

(ক) সুদূর-প্রাচ্যে মার্কিন বেষ্টনী নীতি ও কোরিয়ার যুদ্ধ

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির চরিত্রগত পরিবর্তন হয়। ইওরোপে সাম্যবাদ-বিরোধী বেষ্টনী নীতি (Policy of Containment) সাফল্য লাভ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদূর-প্রাচ্যে এক অভাবনীয় সংকটের সম্মুখীন হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ শতকের প্রথম খণ্ডযুদ্ধের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতিতে ইওরোপকেন্দ্রিকতার অবসান হয় এবং এশিয়ার ভূখণ্ড মার্কিন বেষ্টনী নীতির প্রধানতম ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

প্রেক্ষাপট ঃ কোরিয়ার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দু'টি বিষয় আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমত, চীনে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সাম্যবাদী শক্তির প্রাধান্য স্থাপন। দ্বিতীয়ত, কোরিয়ার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিভাজন এবং এক আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের অবতারণা।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রণকৌশলের দিক থেকে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা এশিয়ার প্রতি ততটা গুরুত্ব দেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মূলত দু'টি উদ্দেশ্য দ্বারা এশীয় নীতি পরিচালিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল দ্রুত জাপানের পরাজয় সম্পন্ন করা এবং একটি শক্তিশালী মিত্রদেশ রূপে চীনকে গড়ে তোলা। জাপানের পরাজয়ের পর মার্কিন রাজনীতিবিদ্‌রা প্রত্যাশা করেছিলেন যে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশরূপে চীন যুদ্ধোত্তরকালে দূর-প্রাচ্যে স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের কাইরো সম্মেলনে চীনের ভূখণ্ড থেকে জাপান যে সমস্ত অঞ্চল গ্রাস করেছিল (মাঞ্চুরিয়া, ফরমোসা ও পেসকাডোরেস দ্বীপপুঞ্জ) সেগুলি চীনকে প্রত্যর্পণ করার জন্য ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এছাড়া চীনকে বিশ্বের পঞ্চ বৃহৎ শক্তির অন্যতম রূপে প্রস্তাবিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় চীন পশ্চিমী দেশগুলির প্রত্যাশা পূরণ করার মত যোগ্যতার পরিচয় দেয়নি। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর চীন এক আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়। চীন একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, পক্ষান্তরে চীনের রাজনীতি দু'টি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে—একটি জনবিরোধী ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী কুয়োমিং-তাং শাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, অন্যটি কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত বিকল্প ক্ষমতার বৃত্ত। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ নীচের জনগণের এক-চতুর্থাংশ সাম্যবাদী শাসনের আওতায় আসে। তাই যুদ্ধ শেষ হ'লে চীনে এক রক্তাক্ত ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং কাইশেক-এর প্রতিক্রিয়াশীল জনবিরোধী কার্যকলাপে চীনের সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বিশেষত কৃষিপ্রধান চীনের জনসংখ্যার চার-পঞ্চমাংশ কৃষক সম্প্রদায় ক্রমশ কমিউনিস্টদের শক্তির মূল সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত হয়।

জনপ্রিয়তার অভাবের ফলে মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াং ক্রমশ পিছু হঠতে লাগলেন এবং মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের মূল ভূখণ্ডে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় (অক্টোবর, ১৯৪৯ খ্রীঃ)।

চীনে কমিউনিস্ট সাফল্যের মূলে অনেকে মার্কিন নীতির ওপর দোষারোপ করেছেন।

প্রথমত, ইয়াল্টা সম্মেলনে (১৯৪৫ খ্রীঃ) রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নমনীয় নীতি গ্রহণ করার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাঞ্চুরিয়ায় ক্ষমতা সুদৃঢ় করে এবং পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানী অস্ত্রশস্ত্র চীনা কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দেয়। এর ফলে কুয়োমিং-তাং-দের সামরিক শক্তি হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশ থেকে সেনা অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কুয়োমিং-তাং-দের স্বপক্ষে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দিক থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদূর-প্রাচ্যের চেয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বেশী দৃষ্টি দেয়। কিন্তু উপরোক্ত অভিযোগগুলি সত্য নয়। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা হয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনে কমিউনিস্টদের পক্ষ অবলম্বন করবে না, সুতরাং সোভিয়েত সহায়তা ব্যতীত কমিউনিস্টদের জয়লাভ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষভাবে কুয়োমিং-তাং-দের পক্ষ গ্রহণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হবে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণের চেষ্টা করে এবং একটি শ্বেতপত্র (White Paper) প্রকাশ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে দুই বিবদমান শক্তির মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য সচে হয়। কিন্তু চিয়াং কাইশেক পরিচালিত জনবিরোধী, অপদার্থ সরকার জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডীন অ্যাকিসন সুস্পষ্টভাবে এইমত ব্যক্ত করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করলেও চীনের রাজনৈতিক পরিবর্তন অবধারিত ছিল, জটিল অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তন ছিল অপ্রতিরোধ্য ("Nothing that this country did or could have done within the reasonable limits of its capabilities could have changed that result; nothing that was left undone by this country has contributed to it.")।

একদিকে যেমন চীনের রাজনৈতিক পরিবর্তন সুদূর-প্রাচ্যে এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর কোরিয়ার পরিস্থিতি সেখানে রাজনৈতিক জটিলতা সূচিত হয়। সুদূর-প্রাচ্যে অবস্থিত কোরিয়া দীর্ঘদিন ধরে সংকটে নিমজ্জিত। উনিশ শতকের শেষভাগে কোরিয়াকে কেন্দ্র করে চীন-জাপান যুদ্ধের সূচনা হয়। চীনের পরাজয়ের পর (১৮৯৫ খ্রী) জাপানের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। যুদ্ধের সময় জাপানকে দ্রুত পরাজিত করার জন্য মার্কিন ও সোভিয়েত সেনাবাহিনী কোরিয়ায় প্রবেশ করে। এদিকে কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কাইরো সম্মেলনে প্রথম চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ৩৮ ডিগ্রী সমান্তরাল রেখার উত্তরে সোভিয়েত বাহিনী ও দক্ষিণে মার্কিন বাহিনীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে জাপানের পরাজয়ের পর যদিও কোরিয়া জাপানের অধীনতা থেকে মুক্তি পেল, কিন্তু কোরিয়া দুই মহাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হ'ল।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্থায়ী কোরিয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে রুশ-মার্কিন মতবিরোধের ফলে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে যৌথ কমিশনের সভায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কোরিয়া থেকে মার্কিন ও সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO)-এর সাধারণ সভায় কোরিয়া সমস্যা নিয়ে প্রতিবেদন পেশ করে। এরপর মার্কিন উদ্যোগে ১৯৪৭-এর নভেম্বরে ইউ.এন.ও.-এর সাধারণ সভা কোরিয়া

সমস্যার সমাধানকল্পে নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি অস্থায়ী কমিশন (United Nations Temporary Commission on Korea) গঠন করে। কোরিয়ায় শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও কোরিয়া থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের দায়িত্ব ঐ কমিশনের হাতে ন্যস্ত হ'ল। ভারতের কূটনীতিবিদ্ কে. পি. এস. মেনন এই কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন।

এরপর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মার্কিন তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়ায় জাতিপুঞ্জের সদস্যদের প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দক্ষিণ কোরিয়ায় সিংম্যান রী-র নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আজ্ঞাবহ একটি সরকার গঠিত হয়। এরপর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিস্ট নেতা কিম উল সুঙ (Kim Il Sung)-এর নেতৃত্বে একটি সোভিয়েত-অনুগামী সরকার ক্ষমতাসীন হয়। উত্তর কোরিয়ার রাজধানী হ'ল পানমুনজঙ্গ এবং এই রাষ্ট্রের নাম হ'ল জনগণতান্ত্রিক কোরিয়া (Peoples' Democratic Republic of Korea)। এইভাবে সোভিয়েত-মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে কোরিয়া দু'টি বিবদমান রাষ্ট্রে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং শান্তিপূর্ণভাবে ঐক্যসাধন অসম্ভব হয়ে উঠল।

একথা সত্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া মার্কিন রণকৌশলের ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্ব পায়নি। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার অনুগত সিংম্যান রী-র নেতৃত্বে (Syngman Rhee) গঠিত সরকার মার্কিন আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছিল। এছাড়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার এক গোপন সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৭৫ মিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্য দেয়। তা সত্ত্বেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে আত্মরক্ষার পরিসীমা (Defence perimeter) গড়ে উঠেছিল, কোরিয়া এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই পরিসীমা উত্তরে আলুইলিয়ান থেকে জাপান ও ওকিনাওয়া অতিক্রম করে দক্ষিণে ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল। তাই যখন উত্তর কোরিয়া আক্রমণ শুরু করে (২৫শে জুন, ১৯৫০ খ্রীঃ) সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে সুপরিকল্পিত ভাবে মদত দিয়ে কোরিয়া উপদ্বীপে এক উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী ও জুন মাসে যথাক্রমে সহকারী মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব কেনেথ রয়াল ও প্রতিরক্ষা সচিব লুই জনসন দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেন। ১৯শে জুন মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের পরামর্শদাতা ও কট্টর সাম্যবাদ-বিরোধী জন ফস্টার ডালেস দক্ষিণ কোরিয়ার আইনসভায় ভাষণে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বৈষয়িক ও নৈতিক সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন।

এরপর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী ৩৮° রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কোরিয়া যুদ্ধের সূচনা হয়। উত্তর কোরিয়াকে আইনগত দিক থেকে আক্রমণকারী বলা হয়ে থাকে এবং এর পেছনে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচ্ছন্ন ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া এই সময়ে কোনপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নিতে চায়নি। চীনের সঙ্গে কোন যৌথ আক্রমণের পরিকল্পনা নেয় নি। অবশ্য অধ্যাপক উইলিয়ম কেলর মনে করেন যে সোভিয়েত সমর্থন ব্যতীত উত্তর কোরিয়া যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার সাহস পেতো না। দক্ষিণ কোরিয়াকে উত্তর কোরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে রাশিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দর ও উপকূলভাগকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া যুদ্ধের পটভূমি

উইলিয়ম কেলর → "The Twentieth Century World."

রচনা করেছিল এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে যে ভাবে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করেছিল, তার ফলে উত্তর কোরিয়া অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক আক্রমণ সংগঠিত করে।

কোরিয়ার যুদ্ধের গতিধারা ও চীন-মার্কিন ভূমিকা ঃ কোরিয়ার যুদ্ধ ছিল একটি দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধ, আঞ্চলিক যুদ্ধরূপে শুরু হয়ে ধাপে ধাপে এই যুদ্ধ একটি ব্যাপক বৃহত্তর সংঘর্ষে পরিণত হয় এবং ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির প্রভাবে প্রথম আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সূচনা হয়। কোরিয় যুদ্ধের গতিধারাকে চারটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়-১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন থেকে ১৯৫০-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় পর্যায়-সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ ভাগ। তৃতীয় পর্যায়ের সময়কাল নভেম্বর (১৯৫০ খ্রীঃ) থেকে এপ্রিল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। শেষ পর্যায়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং দুই বর্ষব্যাপী আলোচনা চলে (জুলাই, ১৯৫১ খ্রীঃ—জুলাই, ১৯৫৩ খ্রীঃ)।

প্রথম পর্যায় ঃ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। এক প্রস্তাব গ্রহণ করে অবিলম্বে বিরোধের অবসান ও ৩৮ ডিগ্রী সমান্তরাল রেখায় উত্তর কোরিয়ার সৈন্য অপসারণ দাবি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদ সমেত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত সংস্থার কার্যকলাপে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। স্বভাবতই ২৫শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী রূপে সাব্যস্ত করা হয়। ২৫শে জুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারকে সব ধরনের সাহায্য দানের অঙ্গীকার করেন। ফিলিপাইনস্-এ অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থেকে সপ্তম নৌবহরকে ফরমোসায় পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। ২৬শে জুন মার্কিন সরকার জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থারকে মার্কিন নৌবহর ও বিমানবাহিনী প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেয়। ২৭শে জুন নিরাপত্তা পরিষদে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে দক্ষিণ কোরিয়ার সিংম্যান রী সরকারকে সকল প্রকার সাহায্য দানের জন্য জাতিপুঞ্জ সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রকে অনুরোধ জানায়। একমাত্র যুগোশ্লাভিয়া ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ভারত ও মিশর ভোটদানে বিরত থাকে। ৭ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ কোরিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাক আর্থারকে জাতিপুঞ্জ বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আরও পনেরটি অনুগত রাষ্ট্র হস্তক্ষেপে অংশগ্রহণ করে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫০,০০০ পদাতিক বাহিনী কোরিয়ায় পাঠায়। জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সিংহভাগ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। স্থলবাহিনীর শতকরা ষাটভাগ, নৌ-বাহিনীর ৮৬ শতাংশ ও বিমানবাহিনীর ৯৩ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করেছিল। প্রসঙ্গত বলা যায়, জাতিপুঞ্জ বাহিনীর প্রতি আক্রমণ সত্ত্বেও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দক্ষিণ কোরিয়ার শতকরা ৯৫ ভাগ অঞ্চল উত্তর কোরিয়ার দখলে আসে।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ পনেরই সেপ্টেম্বর থেকে জাতিপুঞ্জ বাহিনীর প্রতি-আক্রমণের গতি বৃদ্ধি পায়। জেনারেল ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে এক বিশাল স্থলবাহিনী ইন চন্ (Inchon) বন্দরে অবতরণ করে এবং উত্তর কোরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর জাতিপুঞ্জ বাহিনী ৩৮ ডিগ্রী সমান্তরাল রেখায় উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে শান্তি রক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হ'ল। কিন্তু সাফল্যের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে জাতিপুঞ্জ বাহিনী সীমিত রক্ষণাত্মক রণকৌশল পরিত্যাগ করে আক্রমণাত্মক রণকৌশল

নিতে মনস্থ করে। আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধের সুযোগে উত্তর কোরিয়ার সাম্যবাদী শাসনকে উৎখাত করে সমগ্র কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় এই প্রস্তাবে জেনারেল ম্যাক আর্থারকে 'কোরিয়ায় স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের' দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ('to take all appropriate measures to insure a stable situation in the whole of Korea')। এই প্রস্তাবের সূত্র ধরে জেনারেল ম্যাক আর্থার ৯ই অক্টোবর ৩৮ ডিগ্রী রেখা অতিক্রম করে জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশের নির্দেশ দেন (৯ই অক্টোবর)। তিন সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর কোরিয়া পদানত হ'ল, রাজধানী পানমুনজং অধিকৃত হ'ল এবং চীন সীমান্ত সংলগ্ন ইয়লু নদীর কাছে জাতিপুঞ্জ বাহিনী অগ্রসর হ'ল।

তৃতীয় পর্যায় ঃ দুঃখের বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করার অভিসন্ধি শুরু করে। নভেম্বরের প্রথমে মার্কিন বোমারু বিমান ইয়লু নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থার ওপর বোমা বর্ষণ করে। এই অবস্থায় চীনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কোরিয়ায় প্রবেশ করে। ২৪শে নভেম্বর জাতিপুঞ্জ বাহিনীর প্রধান জেনারেল ম্যাক আর্থার এক ব্যাপক যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২৬শে নভেম্বর চীনাবাহিনী রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীকে দক্ষিণে তাড়া করে এবং ৩৮ ডিগ্রী রেখা অতিক্রম করে। শেষপর্যন্ত ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল অধিকৃত হয়।

ইতিমধ্যে চীন অনুকূল সামরিক পরিস্থিতির সুযোগে তিন-দফা দাবি পেশ করে। এগুলি হ'ল—(১) কোরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সেনা অপসারণ, (২) ফরমোসা দ্বীপ চীনকে প্রত্যর্পণ এবং (৩) কমিউনিস্ট চীনকে জাতিপুঞ্জের সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্তি।

চীন যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত কোরিয়ার যুদ্ধের চরিত্র ছিল সীমিত। কিন্তু চীনের যোগদানের ফলে যুদ্ধ এক বৃহত্তর আন্তর্জাতিক চরিত্র ধারণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করে—তার লক্ষ্য ছিল সমগ্র কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি অনুগত রাষ্ট্র স্থাপন। কিন্তু ক্রমশ সাম্যবাদ-বিরোধী বেষ্টনী নীতি (Containment policy) প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট করতে প্ররোচিত করে।

হার্টম্যান প্রমুখ লেখকদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সচেতনভাবে কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। উত্তর কোরিয়ার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব প্রতিপালন করা তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হার্টম্যানের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে উত্তর কোরিয়া আক্রমণকারী ছিল, তাহ'লে কেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ৩৮ ডিগ্রী রেখা অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করেছিল? যদি ৩৮ ডিগ্রী রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশের জন্য উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তাহ'লে জাতিপুঞ্জ বাহিনীকেও একই দোষে অভিযুক্ত করা যায়। এছাড়া যদিও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে শান্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী মার্কিন প্রতিরোধের নামান্তর ছিল।

ইতিমধ্যে চীনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়। ১৪ই মার্চ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী পুনরায় সিওল অধিকার করে নেয়। ২৫শে মার্চ ৩৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা অতিক্রম করা হ'ল। কিন্তু যুদ্ধের গতিধারায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হ'ল। মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাক আর্থার যুদ্ধকে আর কোরিয়ায় সীমাবদ্ধ না রেখে চীনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড

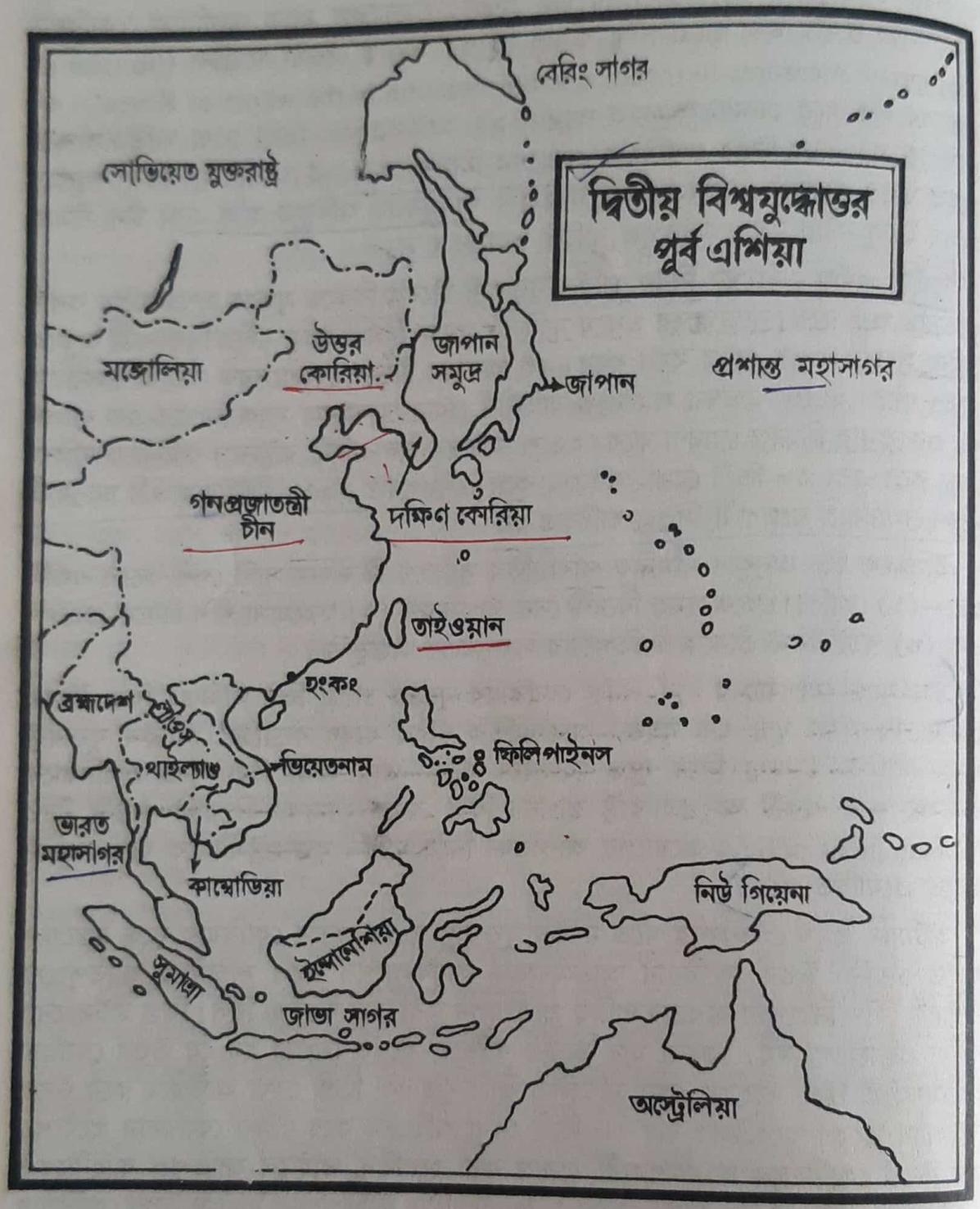
বেরিং সাগর
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর
পূর্ব এশিয়া
মঙ্গোলিয়া
উত্তর
কোরিয়া
জাপান
সমুদ্র
জাপান
প্রশান্ত মহাসাগর
গণপ্রজাতন্ত্রী
চীন
দক্ষিণ কোরিয়া
তাইওয়ান
হংকং
ব্রহ্মদেশ
থাইল্যাণ্ড
ভিয়েতনাম
ফিলিপাইনস
ভারত
মহাসাগর
কাম্বোডিয়া
নিউ গিয়েনা
ইন্দোনেশিয়া
সুমাত্রা
জাভা সাগর
অস্ট্রেলিয়া

প্রতিশোধ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবে চীনের উপকূলভাগকে নৌ-শক্তি দ্বারা অবরোধ এবং চীনের সামরিক ও শিল্পকেন্দ্রগুলির ওপর আকাশপথে বোমা বর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু ম্যাক আর্থারের জঙ্গী রণকৌশল মার্কিন রাজনীতিবিদ্‌দের মনঃপূত হয় নি। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সুদূর-প্রাচ্যে একটি দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধে জড়িত হয়ে অকারণ ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশগুলিও সুদূর-প্রাচ্যে জড়িয়ে পড়ে ইওরোপের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে চায়নি, রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ম্যাক আর্থারকে বরখাস্ত করলেন (১১ই এপ্রিল, ১৯৫১ খ্রীঃ) এবং জেনারেল ম্যাথু রিজওয়ে (Mathew Ridgway) কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হ'ল।

শেষ পর্যায় ঃ ম্যাক আর্থারের পদচ্যুতি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাল। বোঝা গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হতে চায় না। এরপর যুদ্ধের গতি মন্থর হ'তে শুরু করে। রাশিয়া যুদ্ধবিরতির জন্য উদ্যোগী হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত প্রতিনিধি যুদ্ধবিরতি ও অস্ত্র সংবরণের জন্য ৩৮ ডিগ্রী রেখা থেকে উভয়পক্ষের বাহিনীকে অপসারণের জন্য একটি প্রস্তাব দেন। দীর্ঘদিন ধরে আলাপ-আলোচনা চলে। দক্ষিণ কোরিয়া অভিযোগ করে উত্তর কোরিয়ার যুদ্ধবন্দীরা স্বদেশে ফিরে যেতে রাজী নয়। যুদ্ধবন্দী সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়। শেষপর্যন্ত এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবর্গের প্রত্যাবাসন কমিশন (Neutral Nations Repatriation Commission) গঠিত হ'ল এবং ভারত এই সংস্থার চেয়ারম্যান হয়। ৮ই জুন (১৯৫৩ খ্রীঃ) যুদ্ধবন্দী বিনিময় সংক্রান্ত আপোস প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে ২৭শে জুলাই বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

কোরিয়া যুদ্ধের ফলাফল ঃ কোরিয়ার যুদ্ধ ছিল একটি নিষ্ফল যুদ্ধ। এই যুদ্ধের আপাত উদ্দেশ্য সফল হয় নি। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সংযুক্তিকরণ সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই কোরিয়ার রাজনৈতিক বিভাজন মেনে নিতে বাধ্য হয়। এছাড়া দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধের ফলে কোরিয়ার দু'টি অংশকেই প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়। অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়, অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয় এবং দুই কোরিয়া যুদ্ধক্লান্ত ও রিক্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, কোরিয়ার যুদ্ধে যোগাদান করে চীন সামরিক সাফল্য প্রমাণিত করে এবং মার্কিন প্রতিশোধ থেকে চীন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার যুদ্ধের সূত্র ধরে চীনে সাম্যবাদী শাসনকে দুর্বল করতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনায় আশঙ্কিত হয়ে ওঠে। কোরিয়ার যুদ্ধে যোগদান করে অবশ্য চীন কূটনৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়নি। চীন জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করতে ব্যর্থ হয় এবং ফরমোসা দখল করার প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায়।

তবে কোরিয়ার যুদ্ধের প্রধানতম তাৎপর্য হ'ল এর ফলে ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতি এশিয়া ভূখণ্ডে সম্প্রসারিত হয়। এতদিন পর্যন্ত ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির কেন্দ্রস্থল ছিল ইওরোপ মহাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু চীনে সাম্যবাদী শাসনের প্রতিষ্ঠা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিহ্বল করে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ চীন-সোভিয়েত চ্যালেঞ্জের সম্ভাবনায় আশঙ্কিত হয়ে ওঠে। অবশ্য কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধ মার্কিন কূটনীতির চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। সোভিয়েত-বিরোধী চরিত্র থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর সাম্যবাদ-বিরোধী সক্রিয় প্রতিরোধ নীতি রূপায়ণে সচেষ্ট হয়। কোরিয়ার যুদ্ধের

অভিজ্ঞতার নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে ফিলিপাইনস্-এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এরপর ১লা সেপ্টেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ব্যবস্থা আনজাস্ (ANZUS) নামে পরিচিত। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরও ৪৮টি রাষ্ট্র শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। একই সঙ্গে পৃথকভাবে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি দ্বি-পাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এই চুক্তি অনুসারে জাপান ওকিনাতায় দ্বীপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তান্তরিত করে এবং সেখানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়। সুদূর-প্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অ-কমিউনিস্ট চীন তাইওয়ান (Taiwan) এর সঙ্গেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে (ডিসেম্বর, ১৯৫৪ খ্রীঃ)। তাইওয়ানকে প্রভূত আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দানের মাধ্যমে সুপুষ্ট করা হয়।

কোরিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদ-বিরোধী বেষ্টনী নীতি প্রয়োগে তৎপর হয়। এদিক থেকে বিচার করলে ভিয়েতনামে মার্কিন অনুপ্রবেশ কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসাফল্যের পরোক্ষ ফল বলা চলে। ইওরোপেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে এবং পশ্চিম জার্মানির সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং কোরিয়ার যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ-বিরোধী আগ্রাসী রণকৌশল (The globalization of containment and Massive retaliation) গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছিল।